লিলিপুটদের সঙ্গে

সুব্রত হালদার

আমার স্বাধীনতা দিবস শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিনের স্বাধীনতা দিবস না এক-এক করে পাক্কা তিরিশ দিনের তিরিশটা স্বাধীনতা দিবস। আসল কথা হল কালকেই আমার ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজ রবিবার, সকাল হতেই প্রত্যেক বছরের মতো হাজির ছোটপিসি আর বড়পিসি। সঙ্গে বড়পিসির ছেলে পটা আর ছোটপিসির মেয়ে রানি আর পিসেমশাইরা। পটা আমারই বয়সি আর রানি ক্লাস থ্রি'তে পড়ে অর্থাৎ আমার আর পটার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। বেশ কয়েকদিন ধরেই ফোনে-ফোনে মা'র সঙ্গে ছোট ও বড়পিসির প্ল্যান-প্রোগ্রাম চলছিল। যদিও আমার কাছে সেটা গোপন রাখা হয়েছিল। এই ভয়ে যে, অতি আনন্দে আমার অর্থাৎ ওঁদের একমাত্র মেয়ের পরীক্ষাটাই মাটি না হয়ে যায়।

সকাল থেকেই বাড়িতে জমজমাট হইচই। বাবা ও দুই পিসেমশাই সামনের ঘরে। তিনটে বাংলা, একটা ইংরেজি কাগজ নিয়ে তামাম দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যৎ ঠিক করতে ব্যস্ত। সাতগাছির সাধুবাবার মন্ত্রপূত মাটির বুজরুকি থেকে সত্যজিৎ, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। মা ও পিসিদের পালা করে রান্নাঘর ও সামনের ঘরের মধ্যে শাটল ককের মতো দৌড়োদৌড়ি চলছে।

আর-একজন বাড়িতে আছেন, যিনি আমাদের তিন বন্ধুর সবচেয়ে প্রিয়। আমার সেজদাদু। সামনের বারান্দায় একটা আরামকেদারায় বসে বই পড়ছেন। মাঝে-মাঝে উঠে এসে বাবাদের আড্ডায় ও আমাদের গল্পের আসরে তদারকি করছেন, আবার গিয়ে বসছেন বই হাতে। বাবার বাবা অর্থাৎ আমার বড়দাদু গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল। মেজদাদু আর ছোটদাদু থাকেন জলপাইগুড়িতে। সেজদাদু থাকেন আমাদের সঙ্গে। বিয়ে-থা করেননি। এককালে এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন। সেটা এখনও বোঝা যায় চেহারায়। বয়স সত্তর হবে, এখনও টানটান হয়ে হাঁটেন। কোনওদিন অসুখ করেছে বলে অন্তত পক্ষে আমার মনে পড়ে না। নেশা একটাই, বই পড়া। আর-একটা দারুণ গুণ আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারেন। অবশ্য সেগুলো সব ঠিক গল্প নয়! সেজদাদুর নিজের সৈনিক জীবনের রোমহর্ষক ঘটনা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একলাফে পটা, রানি আর আমি সেজদাদুর ঘরে। সেজদাদু তখন খাওয়াদাওয়া শেষ করে একটু গড়িয়ে নেবেন বলে সবে খাটে গিয়ে বসেছেন। আমরা তিন জন তড়াং করে খাটটা দখল করে নিয়ে বললাম, "দাদু গল্প বলো।"

বালিশ সরিয়ে খাটের চতুর্থ কোনাটা দখল করে বসে রানিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "গল্প শুনবি, কিসের গল্প?"

রানির একটাই ফেভারিট সাবজেক্ট, "ভূতের।"

"ধুর বোকা, ভূত বলে কিছু আছে নাকি?"

"নেই মানে? এত-এত গল্প, বই ভূতেদের নিয়ে। কেউ-কেউ ফোটোও তুলেছে বলে শোনা যায়, আর তুমি বলছ ভূত নেই!" প্রতিবাদটা আমার দিক থেকেই উঠল, সঙ্গে পটার মাথানাড়া সমর্থন।

"ঠিক আছে, তবে তোদের ব্যাপারটা খুলেই বলি। কিন্তু মনে রাখিস, এটা কিন্তু কোনও গল্প নয়। যাকে বলে, আমার জলজ্যান্ত অভিজ্ঞতা। তার আগে কথা দিতে হবে, কাউকে ফাঁস করবি

না, টপ সিক্রেট। ”

আমরা দারুণ কিছু একটা আঁচ করে একে অপরের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা পর্বটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুললাম। সেজদাদু গল্প, থুড়ি, তাঁর অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুরু করলেন।

“তখন আমার বয়স কত আর হবে? এই ধর সাতাশ-আঠাশ। সবে আমার ফ্লাইং ট্রেনিং শেষ হয়েছে। পোস্টিং ছিল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটা এয়ারবেসে। জায়গাটার নাম বলা যাবে না, টপ সিক্রেট।”

পটা অধৈর্য হয়ে বলল, “থাক, জায়গাটার নাম লাগবে না, ঘটনাটাই বলো না।”

“তখন নিয়ম করে আমাদের ট্রায়ালে যেতে হত। ট্রায়াল মানে বুঝিস? রোজ পালা করে প্লেন নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ওড়া। একদিন এরকমই একটা ট্রায়ালে বেরিয়েছি। আমি কো-পাইলট, আর প্লেনটা চালাচ্ছে আমাদেরই একজন সিনিয়র পাইলট। আমাদের সমুদ্রের উপর কয়েকশো কিলোমিটার চক্কর দিয়ে আবার বেস-এ ফিরে আসার কথা। কিন্তু মুশকিলটা বাধল মাঝপথে। তখন আমরা মেন ল্যান্ড থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে।

“সিনিয়র পাইলট বলল, ‘মল্লিক, ডেঞ্জারাস ব্যাপার। প্লেনে গন্ডগোল ধরা পড়েছে।’

“ ‘কী গন্ডগোল,’ জিজ্ঞেস করতে বলল, ‘সম্ভবত ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে ইঞ্জিনে ফুয়েল আসার পাইপটা ফেটে গিয়েছে, উই আর ইন ডেঞ্জার।’

“আমি সিনিয়র পাইলটকে বললাম, ‘ব্যাক করো। এক্ষুনি বেসে ফিরে যেতে হবে।’

“ ‘তার আর উপায় নেই মল্লিক। ফুয়েল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে ইঞ্জিন শাট ডাউন হয়ে গিয়েছে। এইভাবে বড়জোর তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার ভেসে থাকা যাবে। তারপর প্লেন ক্র্যাশ করবে।’

“আমি প্রশ্ন করলাম, ‘তা হলে উপায়?’

“সিনিয়র পাইলট নির্দেশ দিল, ‘প্যারাশুট রেডি করো। এখানে অনেক ছোট-ছোট দ্বীপ আছে। ওখানে জনবসতি নেই কিন্তু প্রাণে বেঁচে যাবে। আমি বললেই তুমি প্যারাশুট নিয়ে জাম্প দেবে। তারপর নেক্সট আইল্যান্ডে আমি জাম্প দেব। প্লেন ক্র্যাশ করছে সেটা বেস ক্যাম্পে জানিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধারকারী দল নিশ্চয়ই আসবে। বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি। আর কোনও অলটারনেটিভ নেই।’

“এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনেই একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। দ্বীপের উপর প্লেনটা আসতেই সিনিয়র পাইলট চেঁচিয়ে উঠল, ‘জাম্প, মল্লিক জাম্প।’

“জাম্প শুনেই চোখ-কান বুজে লাফিয়ে পড়লাম। প্যারাশুটটা পিঠে বাঁধাই ছিল। নীচে নামছি তো নামছিই, নীচের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না। কারণ, যদি দেখি তলায় সমুদ্র, তা হলে তো হয়েছে, ভবলীলা সাঙ্গ। ভয়ে-ভয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি সমুদ্র নয়, বরং একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ। একটু অদ্ভুত ধরনের। সামুদ্রিক দ্বীপ যেমন গাছগাছালিতে ঢাকা থাকে তেমন নয়। অনেকটা মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে সমতলভূমি। মনে একটু বল এল। কোনওমতে প্যারাশুটটা কন্ট্রোল করে ঠিকঠাক ল্যান্ড করলাম। প্যারাশুটটা কোনওমতে খুলে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এমনভাবে শুয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মনে হল কোথা থেকে যেন একটা নীলাভ আলো আমার

শরীরে এসে পড়ছে। শরীরটাও গরম হয়ে উঠল। মিনিটখানেক পরে আলো নিভে গেল। তারপরই বাঁ হাতটা টনটন করে উঠল। ঠিক ইঞ্জেকশনের সুই ফোটালে যেমন হয়, তেমন আরকি। অথচ চারদিক শুনশান, কেউ কোথাও নেই। তারপরই তো আসল ঘটনাটা ঘটল।"

"বলো না, বারবার থামছ কেন!" পটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল। বোঝা গেল পটার আর তর সইছে না।

"বলব, বলব, তার আগে বল, আজ সকালে আমি যখন বারান্দায় বসে বই পড়ছিলাম, তখন কে আমার মাথায় টোকা মেরেছে? না বললে কিন্তু আমি আর কিচ্ছু বলব না।"

আমরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সহজেই ধরে ফেললাম অপরাধী কে। রানি ফিক করে হেসে দিল, "হেঁ।"

সেজদাদু রানির কানটা আলতো করে মলে দিয়ে আবার শুরু করলেন, "তারপর? তারপরই চোখের সামনে থেকে পরদা সরে যেতে থাকল। আস্তে-আস্তে ফুটে উঠতে লাগল ঘর, বাড়ি, রাস্তা, গাছগাছালি, সব কিছু। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের পরে যেমন আস্তে-আস্তে সকাল হয়, সব কিছু অন্ধকার থেকে আবছা, আবছা থেকে পরিষ্কার হতে থাকে, ঠিক সেরকম। দেখলাম ধু-ধু মাঠ কই, এ তো একটা বিরাট জনবসতি। আরও কী দেখলাম জানিস, আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন ছোট-ছোট মানুষ।"

"বুঝেছি-বুঝেছি, তুমি 'গালিভার ট্রাভেলস'-এর লিলিপুটদের গল্প বলছ। বাবা আমাকে আগেই বলেছে। আমি সব বুঝি। আমি অত বোকা নয়, বুঝলে!" রানি রেগেমেগে বেণি দুলিয়ে দু'-হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে দাদুকে বকে উঠল।

দাদুও রানির অঙ্গভঙ্গি নকল করে বললেন, "মোতেই না, মোতেই না। আগে শোনোই না, বুকা কুথাকার!"

"আমাকে বুকা বলবে না বলে দিচ্ছি।"

দাদু প্রত্যুত্তরে বললেন, "রানি, তুমার রাজা কই?"

ব্যস, আমরা জানি এবার দক্ষযজ্ঞ লেগে যাবে। রানিকে 'রানি, তোমার রাজা কই' একবার বললেই হল। যে বলবে তাকে কামড়ে, আঁচড়ে, কিল, চড়, ঘুসিতে একেবারে ঠান্ডা করে দেবে। আসরটা কেঁচে যেতে বসেছে দেখে, আমি আর পটা কোনওমতে যুদ্ধরত সেজদাদু ও রানিকে ঠান্ডা করলাম। অন্য সময় হলে এত সহজে রানিকে বাগে আনা যেত না। কিন্তু গল্প শোনার লোভে রানি অল্পেই শান্ত হল।

"শোন তবে। ছোট হলেও অত ছোট না। লিলিপুটরা তো আঙুলের সাইজের। এরা কিন্তু সে তুলনায় বেশ বড়। এই ধর, আমাদের হাতের মাপ ধরলে, বড়রা হচ্ছে হাত দু'য়েকের লম্বা। ছোটরা হাতখানেক হবে। তবে বামন আকৃতির ভেবো না, ঠিক আমাদের মতোই ছিমছাম। প্যান্টশার্ট পরা, পায়ে জুতো, কারও গলায় টাই। শুধু মাপটা লম্বা-চওড়ায় আমাদের অর্ধেক।"

আমরা সব চুপ। শুধু মাঝে-মাঝে হ্যাঁ হু করে যাচ্ছি, যাতে গল্পে ছেদ না পড়ে!

ওদেরই একজন আমাকে পরিষ্কার হিন্দিতে প্রশ্ন করল, "আপকা তবিয়ত ক্যায়সা লগ রহা হ্যায়?"

পটা বলল, "হিন্দি না, হিন্দি না, ওসব হিন্দিটিন্দি বুঝি না, তুমি বাংলা করেই বলো।"

"ঠিক আছে, বাংলাতেই বলছি। ওদের একজন প্রশ্ন করল আমি ঠিক আছি কি না। চোটটোট লাগেনি তো! ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, ওদের হাতে কোনও অস্ত্রসস্ত্র নেই। শুধু কয়েকজনের হাতে ছোট-ছোট পেন, নোটবুক, ফাইল আর কিছু যন্ত্রপাতি। সবই খুব ছোট সাইজের। ওদের মাপমতো। বুঝলাম, ওরা আমার কোনও ক্ষতি করতে আসেনি। উঠে বসে বললাম, 'আমি ঠিক আছি, আপনারা কারা?'

"ওরা বলল, 'আমরাও মানুষ। তবে তোমাদের চেয়ে ছোট আকৃতির। এই যা।'

"আমার কাছে সবই স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। ওদের বললাম, 'কিন্তু আমি নীচে নামার সময় দেখলাম ধু-ধু মাঠ। নীচে নেমেও তাই।'

" 'ঠিকই দেখেছ। আমরা তোমাদের চেয়ে বিজ্ঞানচর্চায় অনেক উন্নত। তাই একটা বিশেষ তরঙ্গপ্রবাহের মাধ্যমে তোমাদের দৃষ্টি থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। যে তরঙ্গপ্রবাহ ভেদ করে তোমরা কিছুই দেখতে পাও না, কিন্তু আমরা পাই।'

" 'তবে এখন দেখছি কী করে?'

" 'তোমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমরা তোমার চোখে একটা বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছি, যার ফলে তুমি সব দেখতে পাচ্ছ। তবে তা কেবল চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। তারপরই ওষুধের অ্যাকশন কেটে যাবে। এটা না করলে তুমি আমাদের বাড়ি, ঘর, শহর, সব মাড়িয়ে তছনছ করে দিতে, নিজেও আঘাত পেতে। সেক্ষেত্রে তোমাকে আমাদের মেরে ফেলতে হত। আমরা কাউকে মারি না।'

" 'কিন্তু আমরা আগেও বিমান নিয়ে এদিকে এসেছি, তোমাদের এই দ্বীপটাকেও তো আগে কখনও দেখিনি।'

" 'আমরা এদিকে কাউকে অ্যালাও করি না। আমাদের দ্বীপটাকে আমরা একটা বিশেষ চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে ঘিরে রেখেছি। তার ফলে এই দিকে কোনও বিমান বা জাহাজ এসে পড়লে সেটা নিজে থেকেই অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে যায়, আবার সোজা চলতে থাকে। জাহাজ ও বিমানের চালকও সেটা ধরতে পারে না। কিন্তু তারা পথ হারায় না, আর আমাদের দ্বীপটাও তোমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়।'

" 'তবে এতসব কিসের জন্য? তোমরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও না কেন? তাতে তো তোমাদেরই লাভ।'

" 'কোনও লাভ নেই, বরং ক্ষতি। আমরা বেশ ভাল আছি। আমাদের কারও কোনও অভাব নেই, মারামারি, যুদ্ধ, হিংসা, ভয়, কিছুই নেই। বরং আমরা তোমাদের স্বভাব জানি। যেই তোমরা আমাদের খবর পাবে তখন দলে-দলে ছুটে আসবে আমাদের দখল নিতে। আমরা বিজ্ঞানে যতই উন্নত হই, তোমাদের মতো অত মারণ-অস্ত্র আমাদের নেই। আর শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণেও তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠব না। তোমাদের কাছে বশীভূত হয়ে থাকতে হবে।'

" 'তা হলে আমাকে এখানে নামতে দিলে কেন?'

" 'কারণ, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তোমরা বিপদগ্রস্ত। বিমানের আর বেশি দূর ওড়ার ক্ষমতা নেই। সোজা চলতে না দিলে তোমরা সমুদ্রে ভেঙে পড়তে। আমরা কাউকে মারি না, বাঁচাই। তাই তোমাদের অ্যালাও করলাম। আর কায়দা করে তোমাকে এই পার্কে ল্যান্ড করালাম, যাতে আমাদের অদৃশ্য বাড়িঘরের উপর পড়ে তোমার বা তোমাদের কোনও ক্ষতি না হয়!'

" 'তোমার কি খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?'

"এতক্ষণের ধকলে সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। সম্মতি জানাতে ওদের একজন দৌড়ে চলে গেল পার্কের কোনায় একটা দোকানে। সেখান থেকে বেশ কিছু আপেল, কলা ও লেবু এনে আমাকে দিল। ফলগুলো দেখলাম আমাদের এখানকার মতোই সাইজে ও স্বাদে। ওদের বললাম, 'এই যে ফল নিয়ে এলে, দাম দিতে হল না? দোকানে তো কোনও দোকানিও দেখছি না।'

" 'দাম? ও, তুমি টাকাপয়সার কথা বলছ? ওসবের প্রচলন এখানে নেই, দরকারও লাগে না।'

" 'সে কী, তবে যারা কাজ করে তাদের মাইনে দাও কী করে?'

" 'মাইনে? মাইনের কী দরকার? কাজ তো করতেই হবে, তার জন্য আবার মাইনে কী? আর কিছু যখন কিনতেই হয় না, এমনিতেই পাওয়া যায়, তখন মাইনে দিয়ে করবেটা কী?'

"আমার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকল, ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য তোমরা এত টাকাপয়সায় জড়িয়ে গিয়েছ যে, তোমাদের পক্ষে সব বোঝা বেশ মুশকিল। শোনো তবে, আমাদের এখানে তোমাদের মতো মন্ত্রী, নেতা, সরকার কিছুই নেই। আছে শুধু একটা কেন্দ্রীয় দপ্তর। আমাদের এখানে যার যা কাজ সে নিজে থেকেই তা করে। তবে দিনে শুধু চার ঘণ্টা, বেশিও নয় কমও নয়। ধরো, কৃষক চাষ করছে আর তার উৎপন্ন ফসল সব জমা দিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় দপ্তরে। শ্রমিক তার কাজ করে চলেছে আর কারখানার উৎপন্ন সামগ্রী সব চলে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় দপ্তরে। কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজ হল শুধু সেগুলো বিভিন্ন দোকানে সমান ভাগে ভাগ করে রেখে আসা। যার যখন যা দরকার তা ওই দোকান থেকেই নিয়ে আসে। সে তুমি চাল, ডাল বলো বা রেডিও, টিভি, খাট, আলমারি সব। তবে যার যতটা দরকার ততটাই নেয়, কেউ অনিষ্ট করে না।'

" 'আর অসুখবিসুখ হলে?'

" 'তার জন্য তো হাসপাতাল আছে। সেখানে ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন। সবাই যে যার কাজ করছে, তবে দিনে ওই চার ঘণ্টা করে। না কেউ কোনও পয়সা দিচ্ছে, না কেউ পয়সা পাচ্ছে। অবশ্য আমাদের এখানে অসুখবিসুখ খুবই কম।'

" 'এই যে আমি এসে পড়লাম, এতে কি তোমাদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে?'

" 'না, না, একেবারেই না। তুমি খেয়াল করেছ কি না জানি না, আমরা প্রথমেই তোমার শরীরটা ইউ ভি লাইট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিয়েছি।'

" 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শরীরটাও গরম হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা, আর-একটা কথা বলো, এই রাস্তাঘাট, বাড়িঘর কারা তৈরি করে?'

" 'এর জন্যও লোক আছে, যারা দিনে চার ঘণ্টা শ্রম দেয় তারপর বাড়ি ফিরে যায়। বাকি বিশ ঘণ্টা নিজের আনন্দ, ফুর্তি আর বিশ্রামের জন্য। বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা গবেষণা করছেন আর তার ফল দেশকে দিচ্ছেন। সিনেমা, থিয়েটার আছে, যেখানে অভিনেত্রী, অভিনেতা আছেন। যার যখন দরকার চলে যাচ্ছে আমোদপ্রমোদে। টিকিটের কোনও ব্যাপার নেই। আসল কথা, সব কাজের জন্যই লোক আছে, আবার সব কিছুতেই সকলের অধিকার আছে। যেহেতু চাহিদামতো সবাই সব কিছু পাচ্ছে, তাই ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, কম-বেশির ব্যাপার এখানে নেই।'

" 'এবার কিছুটা বুঝতে পারছি, ঠিক তেমনই গায়ক আছেন, গান করছেন, রেকর্ড বের করছেন। পুলিশ আছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে।'

" 'দ্বিতীয়টা ঠিক হল না, পুলিশের কী দরকার? সব কিছু যখন এমনিতেই পাওয়া যায়, তখন চুরি-ডাকাতির দরকার পড়ে না। তাই পুলিশের কী দরকার?'

" 'বাঃ, এ তো দারুণ! আচ্ছা বলো, তোমাদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনও যোগাযোগ নেই, তবে তোমাদের যা-যা দরকার সব কি এই দ্বীপেই পাও? যেমন ধরো, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন ধাতু, কয়লা, পেট্রল?' "

রানি ফোড়ন কাটল, "পুতুল?"

পটার কড়মড়ে চাউনিতে রানির প্রশ্নটা মাঠে মারা গেল।

" 'হ্যাঁ, সেগুলো এখানে পাই বলেই আমরা এই দ্বীপটা বেছে নিয়েছি। তবে কয়লা, পেট্রল নেই বললেই চলে। আর তার দরকারও নেই। ওগুলো উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে, পলিউশন!'

" 'গাড়িঘোড়া চলে কিসে?'

" 'গাড়ি বলতে মোটরগাড়ি। কারণ, আমাদের ট্রেন, বিমানের তো দরকার নেই। মোটরগাড়ি চলে সৌরশক্তিতে। তার জন্য অবশ্য আমাদের বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নেই, ওটা তোমরাও পার। তবে, আমাদের গাড়িগুলো খুব ছোট তো, তাই অসুবিধে হয় না। বিদ্যুৎ তৈরি হয় সৌরশক্তিতে। অবশ্য কিছু জলবিদ্যুৎ ও হাওয়াকল আছে। সেই বিদ্যুৎ দিয়েই সব কাজ হয়ে যায়। যেমন আলো, পাখা, লিফ্‌ট, এমনকী রান্না পর্যন্ত, সবই। ফলে, এখানে কোনও পলিউশন নেই।' "

"রাতটা কাটল কোথায়? পার্কে শুয়েই?"

"ধ্যাত, তা কী হয়! অবশ্য একটা সমস্যা হয়েছিল। ওদের বাড়িঘরের দরজা এত ছোট

সব নায়কের সেরা নায়ক ঋজুদা।
বাড়ির প্রত্যেকের পড়ার মতো বই।
সত্যিই যে, তা জানার জন্যেই পড়ুন।

বুদ্ধদেব গুহ-র

ঋজুদা সতেরোটি কাহিনী

আরও দুই ঋজুদা
[প্রজাতি, প্রজাপতি • যমদুয়ারে] ৪০

আরও তিন ঋজুদা কাহিনী
[ছোটিডোঙ্গরির চিতা • কেশকালের বাঘিনী • ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী-তাড়োবাতে] ৪০

দুটি ঋজুদা কাহিনী
[লিলি সিম্পসন-এর বাঘ • ফাগুয়ারা ভিলা] ৩০

ঋজুদার চার কাহিনী
[ডেভিল'স আইল্যান্ড • হুলুক পাহাড়ের ভালুক • অরাটাকিরির বাঘ • মোটকা গোগোই] ৪০

ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে ২৫
ঋজুদার যুগল অ্যাডভেঞ্চার
[ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে • ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে] ৩০

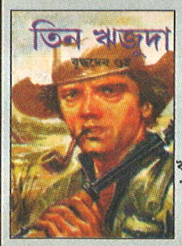

তিন ঋজুদার
[ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো • জুজুমারার বাঘ • ঋজুদার সঙ্গে রাজডেরোয়ায়] ৪০

সাহিত্যম্ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ২২৪১-৫৭২৮/৪০০৩/৯২৩৮।
ফ্যাক্স : (০৯১) (০৩৩) ২২১৯০৪৬৬
E-mail:sahityam@vsnl.com web:www.nirmalsahityam.org

পত্র ভারতীর ক্লাসিক সংকলন

প্রবাদপ্রতিম পত্রপত্রিকাগুলি থেকে নির্বাচিত
অবিস্মরণীয় সব গল্প নিয়ে অবশ্য সংগ্রহীতব্য

গল্পসম্ভার সিরিজ

প্রবাসী • যুগান্তর
মাসিক বসুমতী
ভারতী • সাহিত্য
উত্তরা • অমৃত
বঙ্গবাণী • বঙ্গশ্রী

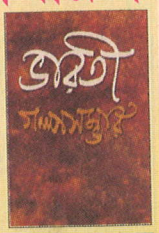

প্রতিটি ১০০

অনীশ দেব সম্পাদিত
দীর্ঘদিন অবলুপ্ত রহস্য-রোমাঞ্চ
পত্রপত্রিকাগুলি থেকে সুনির্বাচিত
গল্পের (১৯৪৮-১৯৮৮) আকরগ্রন্থ

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার

সেরা ১০০ গল্প

৩০০.০০

লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, নারায়ণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ

৩০০.০০

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস

প্রিয়নাথ, দীনেন্দ্রকুমার থেকে হেমেন্দ্রকুমার, শরদিন্দু, শিবরাম, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রমুখ

রয়্যাল সাইজে ৮২৪ পৃষ্ঠার রাজকীয় সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য প্রথম দুষ্প্রাপ্য বার্ষিকী

পার্বণী ১০০.০০

ঐতিহাসিক পত্রিকা থেকে নির্বাচিত

সেরা রংমশাল ২০০.০০

সেরা সমগ্র

কিশোর ভারতী ১৭০.০০

নির্বাচিত ১৫ উপন্যাস

কিশোর ভারতী ১০০.০০

ফোন বা ই-মেল করলেই বই পৌঁছে যাবে

পত্র ভারতী ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫, ২৩৫০ ১৯৪৪
ই-মেল patrabharati@vsnl.net
ওয়েবসাইট patrabharati.com

যে, সেখান দিয়ে ভিতরে ঢোকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক চিন্তা করে একটা উপায় বের হল। একটা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে আমাকে রাখার ব্যবস্থা করল। স্টেডিয়ামের দরজা দিয়ে আমাকে অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল, কিন্তু ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। একটা বিরাট হলঘরের সমান।"

"তারপর?"

"খুবই ক্লান্ত ছিলাম। গভীর ঘুমে রাতটা কেটে গেল। সকাল হতেই একগাদা নানা ধরনের খাবার নিয়ে ওরা হাজির।

"প্রাতরাশ সম্পূর্ণ হতেই ওদের একজন বলল, 'চলো, এবার যাওয়ার সময় হয়েছে। তোমাকে আমরা তোমার বন্ধু যেখানে নেমেছে, সেই দ্বীপে রেখে আসব। অবশ্য, তার আগে একটা কাজ আছে। আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা টিভিতে, সিনেমায় তোমাদের দেখেছে, কিন্তু স্বচক্ষে দেখেনি। তাই, আজ সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ওই পার্কে জমা হবে। তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করে যাও, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

" 'না, আপত্তির কী আছে? তবে ওরা কি আমার ভাষা বুঝতে পারবে? তোমরা কি পৃথিবীর সব ভাষা জানো, নাকি, এমন কোনও যন্ত্র আছে, যা যে-কোনও ভাষাকে তোমাদের ভাষায় অনুবাদ করে, আবার তোমাদের ভাষাকে তাদের ভাষায়?'

" 'কী আজগুবি কথা বলছ! ওসব গল্প, উপন্যাস, কল্পকাহিনিতে হয়। বাস্তবে হয় নাকি? আমাদের এখানেও ওই ধরনের গল্পের প্রচলন আছে। তাতে ছোটদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়। তবে, তুমি আমাদের বোধ হয় অতিমানব ভাবছ! আসলে আমরা কিন্তু তোমাদের মতোই। পার্থক্যটা হল, চেহারায় অর্ধেক কিন্তু বুদ্ধিটা দ্বিগুণ।'

" 'তা হলে তোমরা হিন্দিতেই কথা বলো?'

" 'না, আমাদের নিজেদের ভাষা আছে। তবে আমরা ভারতবর্ষের খুব কাছে বলে হিন্দিটাও চর্চা করি। ইংরেজিটাও জানি। আর কেউ-কেউ অন্য ভাষাও চর্চা করে। ঠিক তোমাদেরই মতো।' "

"এর পর হাঁটতে-হাঁটতে গেলাম পার্কে। রাস্তায় আমার মাথাসমান উঁচু ইলেক্ট্রিকের পোস্ট ও তারগুলোকে সন্তর্পণে নিচু হয়ে অতিক্রম করে যখন পার্কে পৌঁছলাম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। পার্কটা সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছে কয়েক হাজার ছোট-ছোট ফুটফুটে ছেলেমেয়েতে, কেউ বা আধ হাত লম্বা, কেউ বা এক হাত। আমাকে দেখে ওদের কী হুড়োহুড়ি, কী মজা! কেউ-কেউ আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেকও করল। সকলের হাতে একটা করে পতাকা। সেটা নেড়ে আমাকে বিদায় জানাল।"

"ওদের নৌকোয় তুমি চড়তে পারলে?"

"ধুর বোকা, ওদের নৌকোয় উঠলে ওটা ভুস করে ডুবে যাবে না! তাই ওরা একটা বড়সড় বোটের ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। সম্ভবত ওটা ওদের জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগে। সেই বোটে করে ওরা আমাকে অন্য দ্বীপে পৌঁছে দিল। ফিরে যাওয়ার সময় ওদেরও খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমারও। ওদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কি আমাদের দেখা হবে না?'

"ওরা বলল, 'হবে, নিশ্চয়ই হবে। তবে আমরাই দেখা করব। তুমি আর আমাদের দ্বীপে ঢুকতে পারবে না।'

"আর-একটা অনুরোধ করল যে, আমি যেন আমার অফিসে ওদের কথা না জানাই, তা হলে ওদের বিপদ হতে পারে। মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ছিল। ওদের কথা দিলাম, অফিসে সব কথা গোপন রাখব। যারা আমার প্রাণ বাঁচাল তাদের ক্ষতি করব, তেমন মানুষ আমি নই।"

"তারপর ওই দ্বীপে বন্ধুর দেখা পেলে? তোমার অফিসের অনুসন্ধানী দল তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে বাঁচাল?" পটার কৌতূহলী প্রশ্ন।

খাট থেকে উঠে ফতুয়াটা গলা দিয়ে গলাতে-গলাতে সেজদাদু বললেন, "সে তো নিশ্চয়ই, তা না হলে ওই দ্বীপেই তো শেষ হয়ে যেতাম! তোদের সঙ্গে বসে এখানে গল্প করতে পারতাম! যা, বিকেল হয়ে গেছে, এবার তোরা খেলতে যা। আমিও একটু বৈকালিক ভ্রমণে যাব।"

আমাদের কৌতূহল কিছুতেই শেষ হওয়ার নয়। কেমন একটা অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। এখন বাস্তবে ফিরতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সেজদাদুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা এখনও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে?"

"সেটা তো বলা যাবে না। টপ সিক্রেট।"

"আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি আসে। কিন্তু তুমি তো ওদের দেখতে পাও না! তা হলে বোঝো কী করে ওরা এসেছে!"

"সেটাও বলা যাবে না। তবে এটা বলে রাখি, আজ সকালে রানিদিদির দুষ্টুমির মতো তোমরা কেউ কখনও আমার মাথায় টোকা মেরো না কিন্তু! এর বেশি কিছু বলা যাবে না। টপ সিক্রেট!"

ছবি: অনুপ রায়